OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 225 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 225 - 232
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিজন ভট্টাচার্যের ‘দেবীগর্জন’ : প্রতিরোধের আলেখ্য

সীমন্তিনী সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID: simontinisaha3@gmail.com
0009-0009-9266-2805

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
কৃষক আন্দোলন, শ্রেণিসংগ্রাম, গণনাট্য আন্দোলন, Indian People's Theatre Association (IPTA), সামন্ততন্ত্র, ভাগচাষী, ভূমিসংস্কার, নারীজাগরণ, গণচেতনা, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, রাজনৈতিক প্রতারণা।

Abstract

বিজন ভট্টাচার্যের ‘দেবীগর্জন’ নাটক স্বাধীনতা-পরবর্তী কৃষকজীবনের শোষণ, প্রতিরোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এক শক্তিশালী আখ্যান। নাটকে বীরভূমের সাঁওতাল ও ভাগচাষিদের জীবনের দুঃখ, জোতদার-মহাজনের অত্যাচার এবং রাজনৈতিক প্রতারণার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতার পর জমিদারি প্রথা বিলোপ হলেও মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারদের শোষণ অব্যাহত থাকে। প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের মতো চরিত্ররা গরিব কৃষকদের প্রতারণা করে জমি ও অধিকার কেড়ে নেয়। কিন্তু কৃষকসমাজ ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়। নাটকের গিরি, রত্না, মংলা ও সঞ্চারিয়ার মতো চরিত্রগুলি সংগ্রামী চেতনার প্রতীক। বিশেষভাবে নারীচরিত্রদের মাধ্যমে নারীর শক্তি ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রত্নার আত্মত্যাগ এবং শেষপর্যন্ত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শোষকের পতনের ইঙ্গিত দেয়। দেবী মায়ের প্রতীকী চিত্রের মাধ্যমে নাটকে দেখানো হয় যে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে জনতার গর্জনই একদিন নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

Discussion

১

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যকে ‘জাত চাষা’ বলেছিলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষকের সংলাপের সাথে, অভ্যাসের সাথে, ভাবনার সাথে তাঁর লেখনীর আত্মতা তাকে যেভাবে কৃষকের সমমনস্ক করে তুলেছে তাতে এ উপাধি তারই প্রাপ্য। সংগ্রামী নিরন্নের লাঞ্ছনা বঞ্চনা তাঁর অনেক নাটকেরই মূল ভাবনা হয়ে উঠেছে। ‘দেবীগর্জন’এ মূলত চাষির যন্ত্রণাকেই স্পষ্ট করে তোলে। বলা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে চাষির অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর এক অনবদ্য আখ্যান দেবীগর্জন।

বিজন ভট্টাচার্য ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই জুলাই অখণ্ড বাংলার ফরিদপুর জেলায় খানাখানপুর গ্রামে জন্মেছেন। বাবা ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ছিলেন ঐ গ্রামেরই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘অরণি’র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বোন সুবর্ণপ্রভা দেবী ছিলেন তাঁর মা। বাবার জীবনাদর্শ, সংগীত প্রীতি ও সাহিত্য অনুরাগের দ্বারা স্বভাবতই ছোটো থেকে প্রভাবিত হন বিজন ভট্টাচার্য। বাবার চাকরিসূত্রে বিভিন্ন গ্রামে বসবাস ও সেখানকার মানুষজনের সাথে মেলামেশার ফলে গ্রামবাংলার জীবনে দুঃখ দূর্দশার চিত্রও তার অন্তঃস্থ হয়। সমাজের মানুষের কাছাকাছি থাকার তাদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 225 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমস্যা অনুভবের অভ্যাস গড়ে ওঠে শৈশব কৈশরেই। পাশাপাশি মা সুবর্ণপ্রভা দেবীর রাজনৈতিক সচেতনতা তাঁকে রাজনীতির অংশীদার হতে উদবুদ্ধ করেন। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখেছিলেন—

> "মায়ের মুখে আমি দেশের মাকে দেখতে পাই। ...দেশের মানুষকে ভলোবাসি ও নাট্য রচনার মাধ্যমে তাদের উদ্বুদ্ধকরার চেষ্টা করি।"[১]

এই মনোভাবই হয়তো তাকে চিরকাল দেশের সেবায় নিয়োজিত রেখেছে।

চব্বিশ পরগণার জে.ডি.স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পর আশুতোষ কলেজে আই.এ. তে ভর্তি হন। বি.এ পড়া শুরু করেন রিপন কলেজে। এই সময়েই সরাসরি জড়িয়ে পরেন ছাত্র ফেডারেশন ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনে, গ্র্যাজুয়েট হওয়া হয় না আর। অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিলে লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব তার আত্মদর্শন ও আত্মউন্মোচনে বাধা হতে পারেনি। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার সাব-এডিটর পদে যোগ দিলে সেখানেই পরিচয় হয় বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষজনের সাঙ্গে। কাজের সূত্রেই কমরেড মুজফফর আহমেদ এর সংস্পর্শে আসেন এবং তৎকালীন সময়ে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির গুপ্ত আন্দোলনে জড়িয়ে পরেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা ওঠার পর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে চাকরি ছেড়ে পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম সদস্য হিসেবে জনগণের পাশে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যান। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণীষ ঘটকের কন্যা মহাশ্বেতা দেবীকে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গণনাট্যের সাথে মতান্তর হলে চলে যান বোম্বে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে স্থাপন করেন নিজস্ব নাট্য সংস্থা। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা থিয়েটার'ও শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি বলে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'কবচকুণ্ডল'। চাকরি, সংসার, স্বজন, দল সব ছেড়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিন্তু অভিনয়, নাটক প্রযোজনা আর কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়তে পারেননি। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে না এলে তিনি নাট্যকার হতেন না। তার পার্টির হয়ে কাজ করা কিম্বা নাটক প্রযোজনা সবই ছিল দরিদ্র, নিরন্ন, নিঃস্ব মানুষের জীবনের অর্থ খুঁজে দেবার লড়াই, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই লড়াই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শেষ হয়ে যায় না, বরং শোষক আসে অন্য ভূমিকায়। এর কারণ কী? 'দেবীগর্জন' নাটকের মধ্যে দিয়ে তার অণুসন্ধান ও লড়াইয়ের ময়দান তৈরির প্রকৌশল এই প্রবন্ধ আলোচনার মূল উপজীব্য।

২

ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে আছে স্বাধীনতার দোরগোড়ায়, দেশ জুড়ে আগস্ট আন্দোলনের ঢেউ। ব্রিটিশ পিছু হঠতে শুরু করেছে। সময়টা চল্লিশের দশক। দেশের মানুষের হিতের জন্য নাটক লিখতে শুরু করলেন এক তরুণ। মঞ্চস্থ হল 'আগুন', 'নবান্ন' ইত্যাদি নাটক। বিজন ভট্টাচার্য বললেন—

> "নবান্ন যখন প্রযোজিত হয় তখন সে নাটক আমি দেশের কথা ভেবেই লিখেছিলাম, কোনো দলীয় রাজনীতি বা বিশেষ মতবাদে প্রভাবিত হয়ে নয়। ১৯৪২ সনে যে অগাস্ট আন্দোলন সে আন্দোলনের পিছনে আমার দলের সমর্থন না থাকলেও আমি একটা উদ্দীপনা বোধ করেছিলাম। কতদিন বিপদের মুখে পড়েছি সে কথা ভাবলেও আজ রোমাঞ্চ হয়। এক এক সময় মনে হয় পাশের যে লোকগুলি খেয়ে পড়ে গেল সেটা আমিও হতে পারতাম-হইনি সেটা একটা accident। আমার দেশে যখন কান্নার রোল উঠল— সে ভুখা মিছিল আমার চোখের সামনে দেখতাম। সেই অবর্ণনীয় দুর্দশা আমার জীবন বিস্বাদ করে দিল। বাড়িতে দরজা বন্ধ করে খেতে বসতাম, খাবার মুখে উঠত না। সবসময়ই মনে হত কিছু একটা করা দরকার। ওই বোবা কান্না আমায় অস্থির করে দিত।"[২]

আর এই সময় শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনেই নয়, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতেও ঘটল পরিবর্তন। প্রচলিত নাট্যধারার বাইরে তৈরি হল নতুন নাট্যগোষ্ঠী, যারা সাধারণের কথা বলে, তাদের অধিকারের কথা বলে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও সেই সময় রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেছে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 225 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "এই শিশু কমিউনিস্ট পার্টি ধরে ফেলেছিলেন সেদিনকার সংগ্রামের রূপটিকে। 'The quarrel between imperialism and the upper classes of Indian society is a quarrel over the booty' - কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি শুরু হল কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ। ইতিমধ্যেই হিটলার হুঙ্কার দিলেন 'যে গণতন্ত্রের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মার্কসবাদের বীজাণু'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই জন্ম নিল ১৯৪২-এর ফ্যাশিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কালচারাল ফ্রন্ট। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জন্ম নিল I. P. T. A. বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ Marx-এর কথাটা মেনে নিয়ে এঁরা programme নিলেন : 'The worried poverty-stricken man has no mind for the finest play, the dealer in metals sees only the market value, not the beauty and originality of the metals. মার্কসের এই থিয়োরীর উপর গড়ে উঠল কমিউনিস্ট পার্টির কালচারাল ফ্রন্ট। এই প্রথম আমরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত programme পেলাম। গণনাট্য সংঘ ঘোষণা করলেন 'বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘা খেয়ে খেয়ে অসন্তোষে বিষিয়ে উঠেছে মানুষের মন, এইসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েই গণনাট্য আন্দোলন নতুন সত্তায় সম্পদশালী হয়ে উঠতে প্রয়াস পেল। এই সংঘের কাজ হল যেমনি একদিকে স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা তেমনি অন্যদিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা জনগণের ব্যাপ্তির মধ্যে টেনে এনে। এই গণসংযোগের মধ্য দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুন ভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে।"[৩]

এই নতুন ভাবনার প্রসার শুরু হল 'নবান্ন' নাটকের হাত ধরে এবং বিজন ভট্টাচার্য হয়ে উঠলেন এই সঙ্ঘের অন্যতম পথিকৃত। তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন' রচনা সমসাময়িক সময়েই। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে বোম্বাইতে IPTA এর উদ্যোগে মঞ্চস্থ হল এই নাটকটি। এই প্রতিবাদের স্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও প্রয়োজনীয় হয়ে পরেছিল। কারণ বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী শক্তির বাড়বাড়ন্ত মানুষের জীবনেকে করে তুলেছিল দূর্বিষহ। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের মানুষ উদবাস্তু সমস্যা, খাদ্যাভাবে ভুগতে ভুগতে হতাশা গ্রস্থ হয়ে পরে, কিন্তু লড়াই - এর ময়দান ছাড়ে না। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে পাঁচের দশকের মধ্যে ভারতের ইতিহাস যেন ঘা খেয়ে খেয়ে নতুন নতুন বাঁক বদলে হাঁটতে থাকে। আর এর ফলেই বাংলা তথা সমগ্র ভারত জুড়ে রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন তা জনমানসের চিন্তা-চেতনায়, শিল্প ভাবনায় এবং প্রভূতক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ১৯৬৩ সালে বিজন ভট্টাচার্য বিরচিত নাটক 'দেবীগর্জন' সম্পূর্ণভাবেই সেই যুগ-সমস্যা, যুগ-চেতনার ফসল; যা সূচনা করেছিল নাট্যসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে কৃষিজীবীর দৃঢ়তর হুঙ্কার। জোতদার মহাজনি অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে 'তোলো আওয়াজ'-এর মন্ত্রে তারা দীক্ষিত হয়েই থেমে থাকেনি, বরং সেই উত্থিত আওয়াজকে পরিকল্পিত যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করে শাসকের মুখোমুখি দাঁড়াতে সক্ষম করেছিল। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেশের কৃষিজীবী মানুষের অবস্থান ঠিক কেমন ছিল এবং তাদের মানসিকতার কী কী পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল তারই জীবন্ত ছায়াছবি 'দেবীগর্জন'।

> "বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী সাঁওতাল চাষীদের কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতে শত্রুকে পরাহত করে, জননীকে খুঁজে পাবার সংগ্রামী সাধনায় দেবীগর্জন রচিত হয়েছে।"[৪]

স্বয়ং নাটককার নাটকের ভূমিকাংশে একথা বলে দিয়েছেন। নাটকটি তিনি উৎসর্গও করেছেন কৃষক আন্দোলনের শহীদের উদ্দেশ্যে। আন্দোলন-প্রতিরোধ-সংগ্রাম সবই গড়ে ওঠে ঐক্যবদ্ধ চেতনা জাগরণের মিলিত প্রয়াসে। এই উৎসর্গের কারণ তিনি বিশ্বাস করেন সংগ্রামের সাফল্যে বলিদান প্রয়োজন, সেই বলিদানের রক্ততিলক রচিত হয় জয়ীর ললাটে। আগত জয় কোনো ব্যক্তির নয় বরং আপামর সংগ্রামী জনগণের; যা এনে দিতে পারে শহীদের আত্মবলিদান। তাদেরই আত্মত্যাগে একদিন নতুন সূর্য উঠবেই এই বিশ্বাসে বদ্ধমূল ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। সেই বিশ্বাসই তাকে প্রেরণা জুগিয়েছে 'দেবীগর্জন' নির্মাণে; যা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সূচনা করেছিল কৃষিজীবীর হুঙ্কার। শোষক মহাজনের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুধু আওয়াজ তোলাই নয় রুখে দাঁড়িয়ে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া আর সেই গণসংগ্রামের বীজকে সরাসরি স্বাধীন বাংলা মাটিতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 225 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রোথিত করা, যার চারা ছড়িয়ে পড়বে দেশ থেকে দেশান্তরে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের কৃষিজীবী মানুষের অবস্থান ঠিক কেমন ছিল? লড়াইয়ের গতি প্রকৃতিই বা কীভাবে অগ্রসর হচ্ছিল? তা যেন স্পষ্ট হয় এই নাটকের মাধ্যমে।

৩

'দেবীগর্জন' নাটকের এই লড়াইয়ে, জননীকে খুঁজে পাওয়ার সাধনায় পুরুষের পাশাপাশি হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়েছে মেয়েরাও স্বমহিমায়, স্বপর্জিত শক্তিতে। তাই নাটকের শুরুতে গিরির হাতে রামদা আর নাটকের শেষে শহীদ হতে দেখি রত্নাকে। নাটকের মূল দুই নারী চরিত্রের পরস্পর সন্নিবিষ্ট সংগ্রামী অবস্থানের মধ্যে দিয়ে নারীশক্তির জাগরণের, বিশেষত দেশীয় রাষ্ট্রিয় প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান নির্ণয়ের হদিশ মেলে। একদিকে জননীকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করে তার অকালবোধনের চিত্র; অন্যদিকে স্ত্রীকে, সাথীকে কর্মসহচরী করে সংগ্রামের ময়দানে মিলেমিশে পথচলা চিত্র— এই দুয়ে মিলে নাটকের ভাবনাবিশ্ব তৈরি হয়েছে। রত্না তো তেমনি একটি মেয়ে, যে বিয়ের পরদিনই স্বামীর হাত ধরে যেতে চেয়েছিলে মাঠে। নম্রসহচরী নয় কর্মসহচরী হয়ে নিজ সংসার তথা গ্রামকে ভরিয়ে তুলতে লড়াই করায় অঙ্গীকারবদ্ধ এই মেয়ে।

দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মুক্তক্ষেত্রে কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মেয়েদের যোগদান এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে নারীবাদের ঢেউ-এর আগমন সহ আরও নানাবিধ কারণ দেবীগর্জন'এর দেবীত্বের দুই আধার নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছে। আন্দোলন-প্রতিরোধ-সংগ্রাম সবই গড়ে ওঠে ঐক্যবদ্ধ চেতনা জাগরণের মিলিত প্রয়াসে। সেই ঐক্যবদ্ধতা শুধু শ্রেণিসাম্যের নয় লিঙ্গ-সাম্যের কথাও বলে। আর এই সাম্যতার ক্ষেত্রে পূর্বতন ও সমসাময়িক ঘটনার অবস্থানগত সহায়তা ও পূর্ববর্তী নাটককারদের ঐতিহ্য নির্মাণ দেবীগর্জন নাটককে কীভাবে করে তুলেছে সাম্যের নিদর্শন তারই প্রতিষ্ঠা দেখানোই উদ্দেশ্য। নাটকের ইতিহাসে নারী প্রগতির উদ্ভব ঘটেছিল মধুসূদনের হাত ধরে। 'শর্মিষ্ঠা', 'তিলোত্তমা' নামকরণেই তার প্রকাশ। তারপর একযুগ কেটে গেছে প্রায় একশত বছরের ব্যবধানে নারী ভাবনায় চেতনায় প্রয়াসে হয়েছে অগ্রগামী। উন্মেষ ঘটেছে নারীবাদী ভাবনার সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গণে। 'দেবীগর্জন' নাটকের মূল উদ্দেশ্য জাগরণের প্রতিবাদের প্রগতির ভীতকে শক্তপোক্ত ভাবে নির্মাণ করা। আর সেই প্রগতির ভীতে নারী-পুরুষ উভয়েরই সহ ও সম অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করতেই নাটককার বিজন ভট্টাচার্য নাটকের নামকরণেও এনেছেন অভিনবত্ব।

৪

নাটকের শুরুতেই গিরি সর্দারকে বলছে —

> "জানঠো গেলেও দেখবি ঠ্যাংঠো টেনে ধঁরছে অরা তুর — বুলবে সর্দার ই কামঠো করেঁ যাও। সব জওয়ান হঁইছে।"[৫]

সংলাপে জাওয়ানদের প্রতি যে ধিক্কারোক্তি তা তাদের অক্ষমতাকেই শুধু ব্যঙ্গ করেনি বরং সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের নেতা আসলে কোনো ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নয় তা স্পষ্ট করে। সকলে মিলে অধিকার বুঝে নেবার লড়াই এর আহ্বানে প্রথমেই গিরির প্রতিস্পর্ধী উক্তি 'আগে ভাগঠো কর'। শোসকের চেহারার কালো কদর্য রূপ সম্পর্কে সচেতন গিরি। মাতৃত্বের স্বাভাবিক দাবিতেই পরবর্তী প্রজন্মকে শিখিয়ে দিচ্ছে 'জোতদারই হাতি'। তবে সে হাতির পায়ের তলায় সংসার সমাজ সহ পিষে মরতে সে রাজি নয়। এ যেন সেই যুদ্ধের সূচনাকাল যা একদিন সার্বিক আকার নেবে, প্রাণ বিসর্জন দেবে গিরি, রত্নার মতো আরও হাজার মেয়েরা-মায়েরা।

সমকালীন আর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন গিরি তাই প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই উচ্চারণ করেছে —

> "কোন বুলে, কোন করে, কোন বাঁচায়, — ই মানুষঠোর দেখা নাই।"[৬]

অর্থাৎ প্রকৃত মুক্তিদূতের আগমন প্রত্যাশী সে। তবে সেই মুক্তিদূত বাইরে থেকে আগত কেও নয়, তাদেরই মধ্যে থেকে জাত সমষ্টিগত শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকারের লড়াইয়ের রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত কোনো নতুন প্রাণ, তরুণ হাওয়া। যে অন্যায়কে হারিয়ে, অত্যাচারীকে নিঃশেষ করবে; লোভীর হৃদয় থেকে উৎপাটন করবে লোভের কড়াল গ্রাস। 'দেবীগর্জন'

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 225 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নাটকের কৃষিজীবীর এই দুর্দশাগ্রস্থতার কারণ সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণির প্রতিভূ মধ্যস্বত্তভোগী জোতদার জমিদারের সীমাহীন অত্যাচার। আর এদের দোসর হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে জাতীয়তাবাদী শ্রেণি চরিত্রের প্রতিভূ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যারা সাপ হয়ে কামড়ায় ওঝা হয়ে ঝাড়ে। একদিকে তারা গরিব ভাগচাষীর ঘরের মানুষ হয়ে তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে জমিদারের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য করে। আর তারপর ছলেবলে কৌশলে সেই ঋণের জালে ফাঁসিয়ে আত্মসাৎ করে ভিটেমাটি। ভাগচাষী বা বর্গাদার পায়না তার নায্য অধিকার, জমি হারিয়ে আবার সে হয়ে পরে কুলি। সরকারি নিয়মের ফোঁকর গলে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে এই সব জোতদার জমিদার ও তাদের সহকারী দালালরা।

জমিদার প্রথার বিলোপ ঘটেছে। আইন বদল হয়েছে, শোষক এসেছে নতুন সাজে। বেনামীতে দখলদারি চালিয়ে জোতদার হয়ে উঠেছে আধিয়ারদের মালিক। কিন্তু এভাবে তো চলবে না? অন্ধকারের অস্পষ্টতা কেটে গিয়ে আলো তো ফুটবেই। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন আলোয় উত্তরণের পথকে। তাঁর প্রথমদিককার নাটকগুলির মধ্যে ক্রমান্বয়ে তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক আন্দোলনের অগ্রগতির ইতিহাস, নির্মাণ করেছেন মানুষের সাহসী হয়ে ওঠার দর্পণ। পর্যালোচনায় বুঝি নিতে পারি সেই উত্তরণ— ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ২৩ এপ্রিল 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'আগুন' নাটকটি। দেখা যায় শহর জুড়ে খাদ্যাভাব, রেশন দোকানের কিউতে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা লাইন। এক যুবক উচ্চারণ করছে— বাঁচতে হবে, বাঁচতে হলে মিলে মিশে থাকতে হবে। অর্থাৎ মানুষ পৌঁছে যায় সেই উপলব্ধিতে যেখানে সংঙ্ঘবদ্ধতাই বাঁচার একমাত্র পথ। এই বছরই ঐ পত্রিকায় ২৯ অক্টোবর প্রকাশিত হয় 'জবানবন্দী' নাটক। দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষ গ্রাম শহরের ফুটপাতে এসে হাত পাতছে। মৃত্যুর আগে কৃষক পরাণ মণ্ডল বেঁচে থাকা সাথীদের উদ্দেশ্যে বলে যায়— ঘরে ফিরে গিয়ে মরচে পরা লাঙলটা খুব শক্ত করে চেপে ধরতে। ফিরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে শেষ হয় এই নাটক। ঐ একই বছরে 'অরণি'তে প্রকাশিত 'নবান্ন' নাটকে মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যার কবলে পরে ঘরছাড়া চাষিরা শহরের লঙ্গরে এসে পৌঁছায়। কিন্তু অনেক লড়াই'-এর পর তারা ফিরে যায় গ্রামে, আবার ধান ওঠে, নবান্নের উৎসবে আনন্দে ভরে ওঠে তাদের জীবন। নাট্যকারের সবচেয়ে সফল নাটক 'দেবীগর্জন'-এ (১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে লিখিত এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) দেখানো হয় সামন্ততান্ত্রিক প্রভু ও রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধির ষড়যন্ত্রের ফলে মানুষের নিজ অধিকার হারিয়ে কীভাবে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু মানুষও বুঝতে শেখে। আন্দোলনকারী কৃষকরা শেষ পর্যন্ত শাসকরূপী ভক্ষকের উদ্যত লাঠিকে ভেঙে গুড়িয়ে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে শেখে, -

> "বাঁচার তাগিদে সঙ্ঘবদ্ধ হয় তারা। গণচেতনার বিভিন্ন আঘাত অভিঘাত এবং অভিজ্ঞতা তাদের শ্রেণীচেতনা জাগ্রত করে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এজেন্ট ত্রিভুবনকে চিনতে আর ভুল করে না তারা। নাট্যকার এইভাবে সাধারণ মানুষকে শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন করেছেন।"[৭]

৫

'দেবীগর্জন' নাটকের ঘটনার মূল চক্রে অবস্থান করছে একটি বর্গাদার পরিবার ও তাদের ঘিরে ঘটে চলা অন্যায় অবিচার। নাটকের সূচনায় বাউরি সাঁওতাল কুলি-কামিন ছেলেমেয়েরা উষাকালে লাইনবন্দি হয়ে কয়লাখনিতে কাজে চলছে গান গাইতে গাইতে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় এরা কি এমন পেয়েছিল যার জন্য তাদের জীবনে সমর সেনের উচ্চারিত 'ধূলোর কলঙ্ক' মুছে যেতে পারে! না তা সম্পূর্ণ মোছে না ঠিকই। কিন্তু এই কুলি কামিনদের জীবন ও জীবিকা পরিবর্তনের কোনো প্রচেষ্টাই কি স্বাধীন দেশের সরকারের তরফ থেকে করা হয়নি? ১৯৫৩ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি প্রথার বিলোপ সে উত্তর স্পষ্ট করে। একটা নতুন শ্রেণির সৃষ্টি হয়; যাদের বলা হয় বর্গাদার বা ভাগচাষী। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়ে বলা হয় বত্রিশ বিঘা জমির অধিক কোনো ব্যক্তি মালিকানার অধীনে থাকবেনা। তবে এই জমিদারের বদলে উদ্ভব হল তারই প্রতিভূ স্বরূপ মধ্যসত্তভোগী সামন্ততান্ত্রিক প্রভু সমাজের। হিংস্রতায় লোলুপতায় তারা হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর। এর মাঝে ঢুকে পরেছে রাজনীতির স্বয়ংক্রিয়া কিছু নেতারা। তাদের পকেটে আর মনে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ক্ষমতার আগ্রাসন ডানা মেলে বেড়াচ্ছে, আর মুখে ঝুলিয়ে রেখেছে স্বার্থত্যাগের বাতেলা। এই আপাত ত্রিমুখী অবস্থানে দাঁড়িয়ে বয়সে অভিজ্ঞতায় প্রবীন সর্দার বলেছে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 225 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"বুঝ করি যদি একটা আওয়াজ না উঠাও তো ধান গেলে জান বাঁচবে কীসে?"[৮]

এই আওয়াজ তোলার, সংঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার যে শক্তি তা মানুষের মনে জাগ্রত হতে শুরু করেছে একথা স্পষ্ট হয়। তাই সংগ্রামী মানুষগুলো ঘর বাঁধে, পর প্রজন্মের স্বপ্ন দেখে, সর্দার-গিরি অভাবের দুঃস্বপ্নকে পাশে সরিয়ে ছেলে মংলার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। শুয়ার-খাসি-পচাই'র আনন্দে মেতে উঠতে মন চায়। কিন্তু যাদের পেটে লাথি মারে প্রভঞ্জনের মতো সর্দার তাদের কি স্বপ্ন দেখা সাজে? দৃশ্য ঘুরে যায় প্রভঞ্জনের উঠোনে। চাষীদের নাম ডাকা হচ্ছে, টিপছাপ দিয়ে ধান মাপজোক হচ্ছে, দিনের আলোয় ঠকছে তারা। মনা নামক চাষিকে পাল্লায় তুলে, তার বুকে পাথর চাপিয়ে তাকে করা হয় বাটখারা। এ যেন শক্তি-দম্ভের আস্ফালন, তীব্র ঔদ্ধত্য। মানুকে পাথরের মতো স্থবির প্রমাণ করার এক পাশবিক আনন্দ। কিন্তু এ সুখের আস্ফালন স্থায়ী হয়না। শুরু হয় প্রতিবাদের রোল —

"ভল্লু : আমার হিসাবঠো ঠিক নাই...
মংলা : বে-আইনি সুদ দিব নাই। নামাই দাও পাথর, বন্ধ করি দাও মাপজোপ।"[৯]

আর তারপরই মংলাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় প্রভঞ্জনের লাঠিয়াল। সকল চাষি রুখে দাঁড়ালে অবস্থা স্থিতিশীল করতে মাঠে নামে ত্রিভুবন সর্দার। চাষিদের পক্ষ নিয়ে বলে—

"লাঠিবাজির যুগ নাই গ, লাঠিবাজির যুগ বিগত।"[১০]

আবার আড়ালে চাষিদের ঘরের লোক হয়ে তাদেরই পিঠে ছুড়ি বসিয়ে প্রভঞ্জনের আখের ভরিয়েছে সে। প্রভঞ্জনকে বলেছে—

"বুঝ করি গলাটো কাটিবার হয়।"[১১]

প্রভঞ্জন দেখায় শক্তির দাপট আর ত্রিভুবন চাল দেয় মানুষের বিশ্বাসের ভিতর ঢুকে পরে। কিন্তু মুখোশধারী শত্রুকেও একদিন চিনে নিতে পারে মানুষ। তাই প্রভঞ্জন যখন গায়ের জোরে সর্দারের সামান্য সময়ের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে খৎ লিখিয়ে জোর করে টিপছাপ দিয়ে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে, তখন একজন যোগ্য গৃহকর্ত্রীর মতো গিরি কর্তাকে সাবধান করে ত্রিভুবনের থেকে। কিন্তু গরিবের নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাদেরই কৃষককুলে জন্ম যে ত্রিভুবনের তার বেইমানিতে কি সহজে বিশ্বাস জাগে? তা ঘটে না বলেই আবার তার ফাঁদে পা দেয় সর্দার। জোয়ান ছেলে মংলা ঘরছাড়া, কয়লাখনির কুলি হয়ে গেছে সে ঘরের মানুষগুলোকে বাঁচাতে। এই তো সুযোগ গরিবের জান-মান ধূলিসাৎ করার। মংলার বৌ রত্নাকে প্রভঞ্জনের খোলানের ধান ঝাড়ার কাজে ঢুকিয়ে দেয় ত্রিভুবন। যার নিজেরই ঘরে ধান উঠতো তাকে হয়ে যেতে হয় খোলানের শ্রমিক আর বিসর্জন দিতে হয় ইজ্জত। প্রভঞ্জন রত্নাকে প্রেমাবশে, উপঢৌকনে মজাতে ব্যর্থ হলে প্রয়োগ করে পশুবল। হিংস্র দাঁত নখে ছিঁড়ে খুড়ে খেতে চায় বঙ্গলক্ষ্মী স্বরূপা রত্নাকে। রত্নাই আসলে এই উর্বরা বসুন্ধরা, যার শরীরের ওপর বলৎকার করে প্রভঞ্জনরা বজায় রাখতে চায় তাদের অভ্যাসগত দাপট। কিন্তু এই অন্যায় অত্যাচার আর কতদিন? পুরো রোজ কাজ করে আধা রোজের পারিশ্রমিক নিয়ে ফিরে আসেনি রত্না—

"আধা রোজের পয়সা আমি লিব নাই।"[১২]

কারণ সে জানে পরিশ্রমের মূল্য বুঝে নেওয়া তার সাংবিধানিক অধিকার। বিপদে পরে ভয়ে হেরে যায় নি, লড়াই করে গেছে শেষপর্যন্ত। প্রভঞ্জনের হাতে থাকা প্রসাধন-সামগ্রীর থালা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে, শেষমেশ প্রভঞ্জনের হাতে বসিয়ে দেয় দাঁত। যেন ক্রুদ্ধ নাগিনী, যার লেলিহান দূর্বিষহ ক্রোধের খাড়া, 'মহাকালের খাঁড়া'র মতো নেচে ওঠে প্রভঞ্জনের মাথার ওপর, ঘনীয়ে তোলে তার পতন। প্রভঞ্জন শুধু ঘৃণা করেছে তাদের, যাদের জমি জিরেৎ অধিকার করে নিজের ক্ষমতা বাড়িয়েছে সে। নিজেকে বিধাতাপুরুষ মনে করে বলেই গরিবগুরবোদের সম্পর্কে বলতে পারে—

"প্যাট-পিঠ সাঁটা কতকগুলান অপোগণ্ড পশু।"[১৩]

পরপর দু-বছর কৃষি ভালো হয়নি, তাসত্ত্বেও জোতদারের পাওনাগণ্ডা বুঝে তো নিয়েছে এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে ভিটেমাটি দখল করেছে। এইসব অন্যায়ের বিরূদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। আর তার আঁচ পেয়েই নীতি বদলের পরামর্শ দেয় ত্রিভুবন—

"পঞ্চায়েতী শাসন তোমাকে এখুনি চালু করিবার হয়।"[১৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 225 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিন্তু ক্ষমতার গর্বে অন্ধ প্রভঞ্জন বলে—

> "আমিই রাজা, আমারই নীতি—ইটাই রাজনীতি।"[১৫]

সে বোঝেনি মানুষ তার অধিকার বুঝে নিতে, জোট বাঁধতে শুরু করলে তাকে ঠেকানো মুশকিল। বিশেষত তরুণ প্রজন্ম যখন এগিয়ে এসে হাল ধরতে শুরু করে, সংগ্রামী জনতাকে পথ দেখাতে শুরু করে তখন জলপ্লাবি উচ্ছ্বাসের মতো সেই ঢেউ আঁছড়ে পরে ক্ষমতালোভীর পিঠের ওপর। ধনাই'র সংলাপেই তা স্পষ্ট হয়—

> "ধর্মগোলায় যি ধান মজুত আছে, সি ধান সক্কালের। আজ যখন দিনঠো খারাপ এসেছে, প্যাট-চিটা দিয়া মরতে লেগেছে মানুষ, তখন ঐ গোলার ধান বাঁট করি দেওয়া হোক ঘর ঘর! ঐ ধানে প্রভঞ্জন সর্দারের কোনো এক্তিয়ার নাই!"[১৬]

লক্ষ্মণ-ভল্লু-সঞ্চারিয়াদের কথায় বোঝা যায় নিরন্ন নিরক্ষর মানুষ নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝেছে সরকার আইন কানুনের অপব্যবহার করে মধ্যসত্ত্বভোগী প্রভঞ্জন ফাঁয়দা তুলছে। তাই সরকারি দপ্তরে ধর্ণা দিতে যেতে প্রস্তুত তারা। শুধু সই সাবুদ দরখাস্ত আবেদন নিবেদনে আর তাদের ভরসা নেই বলেই সরাসরি পঞ্চায়েতে নিজের দাবি নিজেদেরই তুলতে হবে — এই সচেতনতা তৈরি হয় সকলের মধ্যে। জীবন দিয়ে ঠেকে শিখেছে যারা তাদের হটানো মুশকিল। প্রয়োজনে পুরোনো পঞ্চায়েতের ওপর নতুন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ যেন শাসন ক্ষমতার হাত বদলে শ্রমজীবীর অধিকার প্রতিষ্ঠার হুংকার। স্পষ্টই বোঝা যায় মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী বিজন ভট্টাচার্য শ্রমজীবীর সরকার প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত যেন দিয়ে যান এখানে। সঞ্চারিয়াদের মতো তরুণদের চোখে প্রতিরোধের আগুন, হাতে অস্ত্র টাঙি। এতদসত্ত্বেও ত্রিভুবন শেষ চেষ্টা চালিয়ে যায় প্রভঞ্জনকে দয়ার পরাকাষ্ঠা করে গড়ে তুলতে। চাষিদের একজন হয়ে সে তাদের দাবি দাওয়া প্রভঞ্জনের থেকে আদায় করে আনে। তার এই মিথ্যাচারে কিছুজন বিশ্বাস করলেও তাদের ভুল ভাঙিয়ে দেয় সঞ্চারিয়া-সর্দাররা। ত্রিভুবন সম্পর্কে বলেছে—

> "ঘরের শত্রু বিভীষণ, সে বড় কঠিন দুশমন!"[১৭]

ষোল টাকার ধান যেখানে তিরিশ টাকায় বিক্রি হয় সেখানে মানুষ পায় না তার একদানাও। তারা প্রস্তুত হয় প্রভঞ্জনকে টেনে নামিয়ে এনে এই মর্ত্য পৃথিবীকে নিজেদের বসবাস উপযোগী করে তুলতে। তাই আজ মায়ের আশীর্বাদ প্রয়োজন। নতুন পঞ্চায়েত সভায় শুরু হয় বিচার। কৃষিঋণ, বীজধান, কর্জ টাকার বাটায়োরা, ফসলের ভাগ বাঁটোয়ারা পঞ্চায়েতের শর্তমতে হবে এবং যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের আবার দখল দিতে হবে— এই সকল দাবি আদায় হয়। প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবন সব প্রস্তাবেই সম্মত হতে বাধ্য হয় কারণ জলের ঢেউ'-এর মতো সমস্ত চাষি তখন ঘিরে ফেলেছে তাদের। কিন্তু যা প্রস্তাবিত হয়েছে সবই ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু মংলা জানতে চায় আজকে মানুষ খাবে কী? তাই সঞ্চারিয়া-ধনাইদের তোলা দাবিকে একধাপ এগিয়ে দিয়ে মংলা বলে খোরাকি বাবাদ ধর্মগোলার ধান সকলের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। অকালবোধনের পুজো ও সেবা সবই হবে আজ। কিন্তু প্রভঞ্জন তা হতে দেয় না, লাঠিয়াল দ্বারা বাঁধা সৃষ্টি করলে তাদের ছত্রভঙ্গ করে উন্মত্ত জনতা দখল নিতে এগিয়ে যায় ধর্মগোলার। আর তখনই সেখানে খুঁজে পায় মৃত অবস্থায় 'মাঠের লক্ষ্মী রত্নাকে'। প্রভঞ্জনের ভয়ংকর হিংস্র স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই তার শাস্তিও মহাকালের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ঘুগর‍্যার হাতের টাঙি নিয়ে মংলা নিধন যজ্ঞে নামে। প্রভঞ্জনের পতনের চালচিত্রে যেন স্পষ্ট হয় শোষকের নিশ্চিত বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীন দেশে শোষিতের বুকে পা দিয়ে, তাদের ভুল বুঝিয়ে নিশ্চিত অধিকার কেড়ে নিয়ে রাজা সেজে বসার যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা তার অবসান ঘটবেই— নাটকের শেষে যেন এই আশ্বাসবাণীই শোনা যায়। পৌরাণিক ঐতিহ্যের মহাকালীর তাণ্ডবলীলার মহিষাসুর নিধনের দৃশ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে নাটক। দেবীরূপী জননী যার গর্ভে জন্মাতে পারে অজস্র সংগ্রামী ভ্রূণ; তার গর্জনের এক দীপ্ত স্লোগানে ধ্বংস হতে পারে মহিষাসুররূপী অন্যায় শোষকের রক্তবীজের ঝাড়। এই সংগ্রামে সেই দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে যার এক হাতে ভরে থাকবে ধানের ছড়া, যা মানুষের ক্ষুধার অন্ন; আর অন্য হাতে ঝুলবে কড়াল খাঁড়া, যা গর্জে উঠবে অন্যায়কারীর মাথার ওপর। 'দেবীগর্জন' নাটক এই ঐতিহ্য ও দ্রোহের মেলবন্ধনের ধারক, যা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য দেখাতে চেয়েছেন; যার দ্বারা এই নাটক হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আলেখ্য।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 225 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. চন্দ্র, দীপক, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ. ১৭৩-১৭৫
২. ভট্টাচার্য, বিজন, 'নবান্ন'-এর নাট্যকারের প্রতিবেদন, বিজন ভট্টাচার্য, নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ১২২
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু, বাংলা নাটকের রাজনীতি ও নবান্ন, বিজন ভট্টাচার্য, নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ১৪৬-১৪৭
৪. ভট্টাচার্য, বিজন, দেবীগর্জন, উষাপতি বিশ্বাস (সম্পাদিত), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ৩৩
৫. তদেব, পৃ. ৮৮
৬. তদেব, পৃ. ৮৯
৭. চন্দ্র, দীপক, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ. ১৮৯
৮. ভট্টাচার্য, বিজন, দেবীগর্জন, উষাপতি বিশ্বাস (সম্পাদিত), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ৮৮
৯. তদেব, পৃ. ৯৪
১০. তদেব, পৃ. ৯৬
১১. তদেব, পৃ. ১০১
১২. তদেব, পৃ. ১১৪
১৩. তদেব, পৃ. ১১৭
১৪. তদেব, পৃ. ১১৮
১৫. তদেব, পৃ. ১১৯
১৬. তদেব, পৃ. ১২৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৩৩